অন্য সুনীলদা

জহর সরকার

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে অক্টোবর, ২০১২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে কবে প্রথম দেখেছি ঠিক মনে পড়ে না। মনে আছে, তারাপদ রায়ের ওখানে এক আড্ডায় একদিন তাঁকে দেখলাম, বয়সে তরুণ, কালো মোটা ফ্রেমের চশমার নীচে এক জোড়া সন্ধানী চোখ। তারাপদবাবু যেখানে খুব প্রাণবন্ত, সরস আর তাঁর পাঞ্চলাইনগুলো দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাতিয়ে রাখতেন, সুনীলদা সেখানে অনুচ্চ, কাউকে ইমপ্রেস করার কোনও দায় নেই তাঁর। হয়তো গ্লাস হাতে আরামে বসে আছেন এক কোণে, কোনও গুণমুগ্ধ তরুণীকে মিষ্টি করে বলছেন, তার চোখ দুটো ভারী সুন্দর। তাঁর এই স্বচ্ছ¨, স্বতঃস্ফূর্ত কথোপকথনের ঢঙই তাঁর লেখায় এনেছিল এক অনায়াস, বিরল গতিময়তা।

কাজের কথায় আসি। ২০০৮-এর শেষ দিকে আমি তখন সবে কেন্দ্রে সংস্কৃতি সচিব হয়েছি, সুনীলদা সাহিত্য অকাদেমির প্রায় ষাট বছরের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে বড়ই গর্বের বিষয়। এম.টি. বাসুদেবন নায়ারকে ডিঙিয়ে সুনীলদার এই জয়লাভ রীতিমত একটা ঘটনা ছিল। এটা সত্যি যে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও, খুব কম সময়ের জন্য হলেও, অকাদেমির সভাপতি হয়েছিলেন, চেয়ারম্যান কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়ায়। গোপীচাঁদ নারঙ্গের কড়া পরিচালনার পর সুনীলদার সহজ নেতৃত্ব অনেকের কাছেই ছিল একাধারে বিস্ময় ও স্বস্তির কারণ। আমার একটা নিদারুণ সমস্যার ব্যাপার ছিল এই যে সুনীলদা দিল্লির দরবারে রাজা সাজার থেকে কলকাতাতেই থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। সব সময়, এমন কী মাঝরাতেও তাঁকে মোবাইলে পাওয়া যেত, কথা বলা যেত। সব কাজের কথা শেষ করতেন এই বলে, ‘আরে বাবা, এই সব কূটনীতির ব্যাপার আমাকে বল কেন, কৃষ্ণমূর্তিকে (ওঁর সেক্রেটারি) জিজ্ঞাসা করো না!’ কিন্তু সব কাজ তো আর সেক্রেটারিকে দিয়ে হয় না। শেষে হয়রান হয়ে বলতেন, ‘জহর, তুমি সাজিয়েগুছিয়ে লিখে দাও ইংরেজিতে, আর আমাকে বল কোথায় সই লাগবে। রাত ন’টা বাজে, এত রাত অব্ধি এই কাজ করার থেকে তোমার আরও ঢের জরুরি সব কাজ আছে তো, না কী?’

সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি হিসেবে নানা বিষয়েই তাঁর সঙ্গে কম মতান্তর হয়নি। সহৃদয় স্বভাব তো কী, তিনি একটি স্বশাসিত সংস্থার প্রধান এবং আমাদের মতো আমলাদের কাজই যে ওই স্বশাসনে নিরন্তর বাগড়া দেওয়া — এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই আমার অনেক শুভার্থী প্রচেষ্টাও বার বার স্বপ্রশ্ন যাচাই করে দেখতেন, ‘আচ্ছা, তোমার আসল মতলবটা কী বল তো?’ মতলব যে শুভ তা তাঁকে বুঝিয়ে যাওয়ার পরই কিছু বেয়াড়া লোক তাঁর কাছে এসে ‘স্বশাসন’, ‘আমলাতন্ত্র’, ‘আধিপত্য’ ইত্যাদি নিয়ে কথা তুলত আর আমার সঙ্গে সম্পর্কটা ফিরে যেত সেই তিমিরে। তবে প্রশাসনিক মতান্তর ব্যক্তিগত মনান্তরে পৌঁছয়নি কখনওই। তিক্ততা ছিল না। জোর তর্ক হত, আর তর্ক একটু জোরালো হলেই তিনি আমাকে একটা সন্ধের জন্য উঠিয়ে নিয়ে যেতেন, মাঝরাত গড়াতে আমরা দু’জনেই আবার একদম ঠিকঠাক, সম্পর্কটাও ফিটফাট।

সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি হিসেবে সুনীলদাই প্রথম সব রাজ্য অকাদেমিগুলোর সমণ্বয় সভা চালু করেছিলেন। অনেক রাজ্য অকাদেমিই তখন নানান কারণে, রাজনীতি আর অবহেলার চাপে পড়ে ধুঁকছে। প্রথম বারের দারুণ সাফল্যের পর এ বছরও ভেবেছিলেন দ্বিতীয় প্রস্থ সভা ডাকবেন, তা আর হল না। শিশুসাহিত্যে তাঁর বরাবরের প্রবল উৎসাহ, শুরু করিয়েছিলেন শিশুদের জন্য জাতীয় পুরস্কার, এ বছর সে

পুরস্কার তিনে পা দিয়েছে। বলতেন, ‘দেখো, এদের মধ্যে অনেকে এক দিন বড় লেখক হবে।’ নিজেও ছিলেন যেন একটি প্রাণচঞ্চল, বেয়াড়া কিশোর। গার্সিয়া মার্কেজ সম্পর্কে যেমন বলা হয়, সুনীলদাও কিন্তু ঠিক তেমনি — গল্প বলতেন এক, ভাবতেন আর এক, শেষ পর্যন্ত লিখতেন এমন একটা কিছু যা এক্কেবারে আলাদা, আনকোরা। হাসতেন, ঠাট্টা-মশকরা করতেন, হাতের সামনে যা পেতেন উপভোগ করতেন, চোখে থাকত এক অদ্ভুত দ্যুতি, যা দিয়ে আসলে পাক্কা আলোকচিত্রীর মতো মাপতেন মানুষের চরিত্রের অতি সূক্ষ্ম খামখেয়ালও। তা স্থান করে নিত তাঁর পদ্যে, উপন্যাসে বা ছোটগল্পে।

সাহিত্য অকাদেমির সভার পরিবেশ এমনিতে খুব উত্তপ্ত হত, কিন্তু সুনীলদা থাকলে একেবারেই নয়। তাঁর অসীম ধৈর্যে আমরাই অনেক সময় বিরক্ত হতাম, বিশেষত যখন বুঝতাম বক্তার বক্তব্য নেহাতই ফাঁকা বুলি। সুনীলদার বোধ হয় একটা অদৃশ্য সুইচ ছিল, বক্তারা যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতেন, তিনি দিব্যি সেটা অফ্ করে রেখে সহাস্যবদনে বসে থাকতেন, নিজের লেখা নিয়ে ভাবতেন।

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন নিয়ে সুনীলদার কী পরিকল্পনা, সে ব্যাপারে আমার বেশ কৌতূহল ছিল, কেননা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ওঁর মতামত তো বহুচর্চিত। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অনুষ্ঠিত এক বিতর্কসভা দিয়ে বছরটা শুরু হল। জাতীয় উদ্যাপন কমিটির সেক্রেটারি হওয়া সত্ত্বেও আমি সভায় বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন করলাম, সুনীলদা কিন্তু ধীর স্থির। যখন বলতে উঠলেন, তখন ওঁর রবীন্দ্র-মূল্যায়নের কাছে অন্যদের বক্তব্য নিতান্ত প্রশস্তিবচনের মতো শোনাল। তিনি ২৪টি ভারতীয় ভাষায় একটা প্রজেক্টের প্রস্তাব পেশ করলেন, যেখানে বিশেষজ্ঞরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মনের যাবতীয় ভাবনা নিজেদের ভাষাতেই উজাড় করে দেবেন। হয়তো প্রোজেক্টটা তৈরি হয়ে কোথাও পড়ে আছে, ওঁর লেখা একটা ভূমিকার অপেক্ষায়। যদি সুনীলদা ইতিমধ্যে সেটা লিখে রেখে থাকেন, তা রবীন্দ্র-বিষয়ক লেখালিখির ভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন হবে।

এক দিন অবসর-মুহূর্তে আমরা দু’জনে ভেবেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, নৃত্যনাট্য, প্রবন্ধ — এ সব বিশ্ব জুড়ে অ-বাঙালি তরুণ পাঠকদের জন্য অল্প দামে কিন্তু শিল্পিত ভাবে পকেট-বই আকারে প্রকাশ করলে কেমন হয়। ইংরেজি আর সব ভারতীয় ভাষাকে গলা টিপে মারছে — সুনীলদা তাঁর এতদিনকার লালিত এই ভাবনার ও পারে গিয়ে এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলেন। প্রথম খণ্ডের জন্য মুখবন্ধ লিখতে বলেছিলেন। লিখেওছিলাম। এই অসামান্য প্রকল্পের অধিকাংশ নির্বাচনই সুনীলদা তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচক-দৃষ্টিতে করেছিলেন, ফোনে অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ততায় বলেওছিলেন রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত কী কী বিষয় থাকবে সেখানে।

এক দিন ফোনে বলেছিলেন, আইসল্যাণ্ড থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ এসেছে, স্বাতীদির খুব যাওয়ার ইচ্ছা। সব আয়োজন হয়েছিল। আমি মজা করে বলেছিলাম, আপনি আর একটু এগিয়ে উত্তর মেরু চলে যান, আর তারপর হেঁটে হেঁটে ঈশ্বরকেও দেখে আসুন এক বার। ‘মন্দ হবে না’, বলেছিলেন তিনি। সে ভ্রমণ আর হয়ে ওঠেনি। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনোর একটা সংক্ষিপ্ততর পথ বেছে নিলেন সুনীলদা।